ছবিতে

খেলাধুলা-স্বাস্থ্য-সামাজিক ও কর্মশিক্ষা পরিচয়

পুষ্পেন সরকার

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকারের নব প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অবশ্য গৃহপাঠ্যরূপে লিখিত ও বিভিন্ন স্কুলবোর্ড, শিক্ষক সমিতি ও মিউনিসিপ্যালিটির পাঠ্যতালিকাভুক্ত

ছবিতে খেলাধুলা-স্বাস্থ্য-সামাজিক ও কর্মশিক্ষা পরিচয়

পুষ্পেন সরকার

[তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য]

নতুন সংস্করণ—১৯৮৯

রঞ্জন প্রকাশন * শৈব্যা প্রকাশালয়

৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

শ্রীগোপাল বল, রঞ্জন প্রকাশন, ৮/১ এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩, কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রাকর ঃ শ্রীসত্যনারায়ণ মণ্ডল, রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টার্স, ৩৪ শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

মূল্য ঃ সাত টাকা মাত্র

খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা

কেবল মাত্র লেখা পড়া শিখলেই মানুষের প্রয়োজন মেটে না। সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে হলে চাই মজবুত ও নীরোগ শরীর। নীরোগ ও সুস্বাস্থ্য সব সময়েই প্রয়োজন। নীরোগ শরীর দেহে মনে আনন্দ ও উৎসাহ আনে ; লেখা পড়া বা অন্যান্য কাজ কর্মে উৎসাহ যোগায়।

কিশোর কিশোরীর সর্বাঙ্গীন বিকাশকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে হলে খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর চর্চাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে। ইংরাজীতে বলে 'হেল্‌থ্‌ ইজ ওয়েল্‌থ্‌', আর বাংলায় বলে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, ব্যায়াম করলেই তো শরীর চর্চা হয় দেহে শক্তি যোগায়, তা হলে খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর চর্চা কেন।

এখানে পরিস্কার মনে রাখা দরকার খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুরা প্রচুর আনন্দ পায়, উৎসাহ পায় কিন্তু নিছক ব্যায়ামটা একেবারে নিরস। কোনো উত্তেজনা নেই, প্রাণ নেই, জেতা হারার কোনো ব্যাপার নেই।

খেলার মধ্যেই শিশুরা বেশী আনন্দ লাভ করে। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধতার একটা উৎস প্রকাশ পায়, একসাথে চলার একটা চেতনার উন্মেষ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুদের দেহ ও মনের সুসমঞ্জস বিকাশ সাধিত হয়। খেলার মাধ্যমে সে শেখে তার জীবনের অন্য দিক। তাই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে খেলাধূলা ও শরীর চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু মনের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমান সিলেবাসে খেলাধূলা ও শরীর চর্চাকে পাঠ্যসূচীর অঙ্গীভূত করা হয়েছে। শরীর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার নিময়গুলি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে পালন করা একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে খেলাধূলা ও শরীর চর্চা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে খেলাধূলা করার নির্দিষ্ট সময় দরকার। দুপুর রোদে খেলাধূলা করা মোটেই উচিত নয়। এতে ভালো হবার বদলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশী।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠবে। হাত মুখ ধোয়ার পর ১০।১৫ মিনিট একটু দৌড়াদৌড়ি করলে শরীরের অবসাদ কেটে যায়। তারপর পড়াশুনা করা যায়। বিকেলে খেলাধূলা করার উপযুক্ত সময়। তবে একই সময়ে বেশীক্ষণ খেলাধূলা করা উচিত নয়। তাতে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম অধ্যায়

খেলাধুলা ও অঙ্গচালনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

খেলাধূলা ও অঙ্গচালনা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ শিশুদের স্বাভাবিক কার্যকলাপ কি কি ?

উত্তর ঃ শিশুরা সাধারণতঃ খেলাচ্ছলে হামাগুড়ি দেয়, জোরে হাঁটে, দৌড়ায়, একপায়ে বা জোড়া পায়ে লাফায়। সে কোনো কিছু ছুঁড়তে, কোনো কিছু ধরে ঝুলতে এবং ভারী কোনো কিছু উপড়ে তুলে ধরতে ভালবাসে।

প্রশ্ন ঃ শিশুরা সাধারণতঃ কি কি অনুকরণ জাতীয় খেলা খেলতে ভালবাসে ?

উত্তর ঃ শিশুরা হাতীর মত ধীরে ধীরে শুড় নাড়িয়ে চলতে ভালবাসে। কখনও বা ঘোড়ার মত কায়দা করে লাফিয়ে দ্রুত বেগে দৌড়াতে চায়। পাখির মত ডানা মেলে উড়তে চায়। দৈত্যের মত ভয়ংকর মূর্তিতে সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করার খেলা খেলতে চায়। বামনের মত ছোট্ট হয়ে হাসির উদ্রেক করে খেলতে চায়। কখনো বা এরোপ্লেনের মত ভোঁ ভোঁ করে উড়ে চলার ভঙ্গীতে দ্রুতগতিতে দৌড়াতে ভালবাসে।

প্রশ্ন ঃ শিশুরা আর কিভাবে অঙ্গভঙ্গী করতে ভালবাসে ?

উঃ ছড়া ও গানের মাধ্যমে নাচতে ভালবাসে।

প্রশ্ন ঃ শিশুদের খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা কেন ?

উঃ খেলাধূলার মাধ্যমেই শিশুরা সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাভ করে। এরা খেলতে খুব ভালবাসে। খেলার মাধ্যমে দেহ-মনের প্রসারতা বাড়ে। শরীর পুষ্ট হয়। প্রফুল্ল থাকে। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে খেলাধূলা ও শরীর-চর্চার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ঃ খেলাধুলা ও শরীর চর্চার উপকারিতা কি ?

উঃ সুন্দর ও সুস্থ জীবন গঠনের জন্য দরকার মজবুত দেহ গঠন ও নীরোগ শরীর। লেখাপড়া শিখলেই জীবনের প্রয়োজন মেটে না। নীরোগ শরীর মনে আনন্দ আনে, সুস্থ ও সবল শরীর কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়ায়।

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনমূলক কাজে কি কি ব্যায়াম শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে ?

উঃ দ্রুততার সঙ্গে লাফানো, ডিগবাজী খাওয়া, মাটিতে সোজা শুয়ে পড়ে দু'পায়ে শূন্যে সাইকেল চালানো। একপায়ে বা জোড়া পায়ে দ্রুততার সঙ্গে লাফানো। দু'পাশে পা ছড়িয়ে দেহকে সামনে ঝোঁকানো। দু'পা পাশে ছড়িয়ে সামনে ঝুকে হাত দিয়ে পায়ের আঙ্গুল ছোঁয়া। ডন-বৈঠক ও বুক-ডন দেওয়া।

প্রশ্ন ঃ আনন্দের সঙ্গে শরীর চর্চা করতে হলে কি কি খেলা শিখতে হবে ?

উঃ জুড়ি খোঁজা, কানমাছি, বুড়ি ছোঁয়া, স্কীপিং রীলে গেম, হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়াবান্দা, ফুটবল, বাস্কেট বল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি।

১। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ কি কি অনুকরণ জাতীয় খেলা লেখতে ভালবাসে ?

(ক) শিশুদের স্বাভাবিক কার্যকলাপ কি কি ?

(খ) শিশুদের খেলাধূলার প্রয়োজন কেন ?

(গ) খেলাধূলা শরীরচর্চার উপকারিতা কি ?

(ঘ) সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে হলে কি চাই ?

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি পূরণ কর ঃ

(ক) নীরোগ শরীর —— আনন্দ ও উৎসাহ —।

(খ) খেলার মধ্যেই — বেশী — লাভ।

(গ) — চলার একটা চেতনার — ঘটার — থাকে।

(ঘ) প্রতিদিন —— খেলাধূলাও —— করা একান্ত প্রয়োজন।
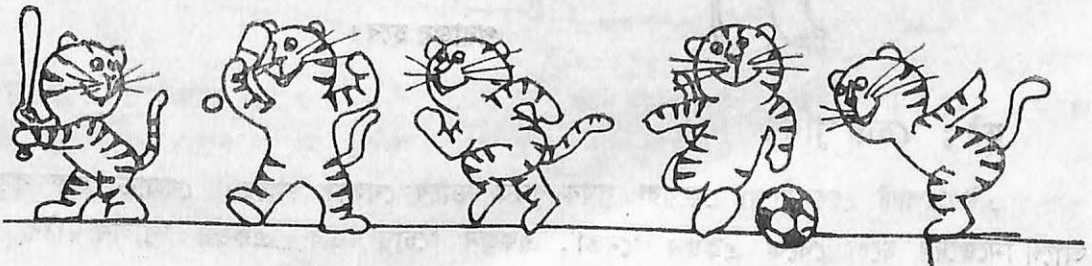
অল্প পরিসরে কয়েকটি খেলা

এক ঃ স্কীপিং রিলে

এই খেলাটি ছোট মাঠেই হয়ে থাকে। সাধারণতঃ মেয়েরাই এই খেলাটি খেলে থাকে। এইজন্য এই খেলাকে মেয়েদের খেলা বলে। মেয়েরা একটি লম্বা মোটা সূতার দুদিক দুহাত দিয়ে ধরে ঘোরাতে থাকে এবং সেই সূতোর ভেতর দিয়ে তালেতালে লাফাতে থাকে। এই খেলাটিকে স্কীপিং খেলা বলে।

সূতাটি পর্যায়ক্রমে ঘুরবে অথচ তাতে পা লাগবে না এটাই স্কীপিং খেলার বৈশিষ্ট্য।

স্কীপিং রিলে করার সময় সমান সংখ্যক মেয়েদের দুটো দলে ভাগ করে দিতে হবে। তারা দুটি পৃথক দলে দাঁড়াবে। দুটি দলের জন্য নির্দিষ্ট-ভাবে পৃথক দুটি ঘরও কাটা থাকবে।

একনম্বর মেয়ে থেকে শুরু করে দুই দলের মেয়েরা নির্দিষ্ট এলাকা দিয়ে স্কীপিং করে অনুরূপ-ভাবে ঘুরে আসবে। যেদল আগে শেষ করবে তাদের জয় হবে। স্কীপিং করতে করতে কেউ পড়ে গেলে যোগ্যতা হারাবে এবং তার দলের পরাজয় হবে।

দুই ঃ চোর পুলিশ

এই খেলাটি ছেলেরা বা মেয়েরা পৃথক পৃথক ভাবে খেলতে পারে। খেলাটি শুরু করবার আগে নিজেদের মধ্যে থেকে একজন 'নেতা', একজন 'চোর' এবং একজন 'পুলিশ' ঠিক করে

নিতে হবে। আর অন্যান্য ছেলেরা বা মেয়েরা মাঠের মাঝখানে গোল হয়ে দাঁড়াবে। খেলা শুরু হবার সময় চোর আর পুলিশ কিছুটা দূরে থাকবে। নেতা বা শিক্ষক মহাশয় খেলা শুরুর নির্দেশ দিলে পুলিশ চোরকে ধরার চেষ্টা করবে; কখনও দৌড়ে কখন বা জোর পায়ে হেঁটে। চোরও পুলিশের হাতে ধরা না পড়ার চেষ্টা করবে। তখন উভয়েই দৌড়াবে এবং বৃত্তাকারে আর সকলে হাত ধরাধরি করে জালের মত দাঁড়াবে। এই চোর ও পুলিশ তাদের ভেতর দিয়েও দৌড়াতে পারবে। চোর ধরা পড়লে আবার নতুন করে চোর পুলিশ হবে। এইভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।
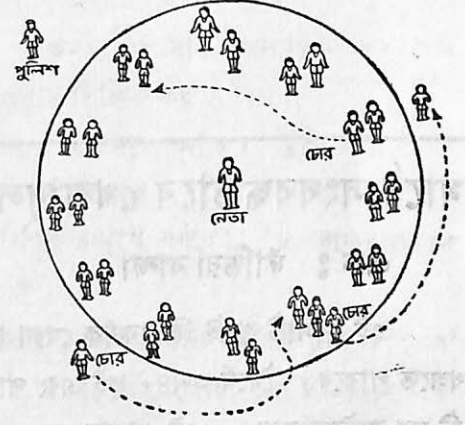
তিন ঃ কানামাছি

এই খেলাটি ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে মিলেমিশে খেলতে পারে। অনেকে একসঙ্গে মিলে এই খেলাটি খেলতে পারবে। প্রথমে একজনের চোঁখ বেঁধে দেওয়া হবে। সেই হবে কানা আর সকলে হবে মাছি। যারা মাছি হবে তারা কিছুটা দূরে দূরে থেকে ডাক দেবে, 'কানাভাই,

ধরতে এস'। সে বলবে 'যাই ভাই মাছি'। সে ডাক শুনে ধরার জন্য এক একজনকে খুঁজবে। খুঁজে খুঁজে যতক্ষণ না ধরতে পারবে ততক্ষণ তার চোখ বাঁধা থাকবে। যখন সে যে কোন একজন মাছিকে ছুঁয়ে দেবে তখন তার চোখ খুলে দেওয়া হবে। যাকে ছুঁয়ে দেওয়া হল তখন সে কানা হবে। এইভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

মাঠে সংঘবদ্ধভাবে খেলাধূলা

এক ঃ দাঁড়িয়া বান্দা

এই খেলাটি খুবই চিত্তাকর্ষক খেলা। একসঙ্গে ১৪ বা ১৬ জন ছেলে বা মেয়ে পৃথক পৃথকভাবে খেলতে পারবে। দৈর্ঘে ৩০।৪০ ফুট এবং পাশে ১৫।২০ ফুট এরূপ একটি চৌকো ঘরের ভেতর ৬টি কিম্বা ৮টি ঘর কাটতে হবে। এই খেলার জন্য বড় মাঠের প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি দুটি করে ঘর কাটা
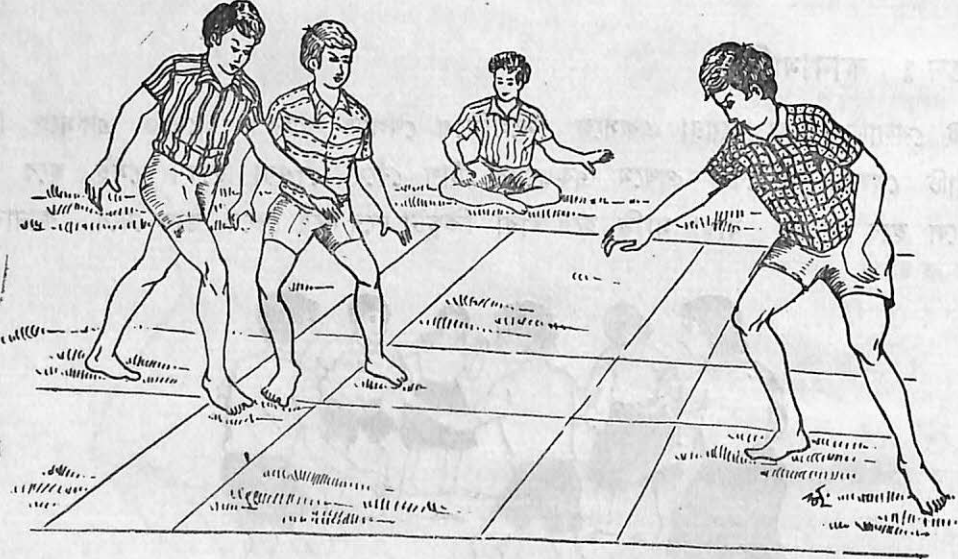
থাকবে। দুটি ঘরের মাঝখান দিয়ে থাকবে পাশের দিকের রাস্তা। দুটি দলের প্রতেকটিতে ৬ অথবা ৮ জন করে খেলোয়ার থাকবে। পাশ দিয়ে বা মাঝখান দিয়ে প্রত্যেক খেলোয়ারকে সারাটা ছক পার হতে হবে। পার হতে গিয়ে কেউ বিপক্ষ দলের কাছে ছোয়া পড়লে, তাকে বসে পড়তে হবে। সব খেলোয়ার ছোয়া গেলে হারবে এবং সব খেলোয়ার ঘরগুলি পেরিয়ে যেতে পারলে জিতবে।

প্রশ্ন ঃ এই খেলা থেকে ছেলেমেয়েরা কি শিখতে পারে ?

উত্তর। ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ানো, লাফ এবং পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার কৌশল শিখবে। এতে সারা দেহের ব্যায়াম হয়।

দুই ঃ খো-খো

এই খেলার জন্য একটি চতুষ্কোণ মাঠের প্রয়োজন। ৬ জন খেলোয়ার খেললে ৬০-৩০´ মাঠ প্রয়োজন। এই খেলা খেলতে হলে প্রথমে মাঠটিকে গুঁড়া চুন দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।

মনে কর 'ক' ও 'খ' দুটি দল। প্রতিদলের ৬ জন করে খেলোয়ার আছে। দুটি দলে সমান সংখ্যক খেলোয়ার থাকবে। 'ক' দলের একজন মাঠের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর অন্যান্য সকলে একই লাইনে একটু ফাঁক ফাঁক করে পরস্পর বিপরীত মুখে বসবে। 'খ' দলের সকলে মাঠের এক পাশে সীমারেখার মধ্যে থাকবে।

রেফারী বাঁশী বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে 'ক' দলের দাঁড়ানো খেলোয়াড় শেষ সীমানার দিকে ছুটে এসে 'খ' দলের খেলোয়াড়কে ছুঁতে চেষ্টা করবে। ছুলেই সে মোর হবে। 'খ' দলের খেলোয়াড়েরা সীমানার মধ্যে থেকে দৌড়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করবে। 'ক' দলের খেলোয়াড় মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর পর তার দলের যে কোন খেলোয়াড়ের পেছনে ছুঁয়ে 'খো' বললেই ঐ দলের সেই খেলোয়াড় উঠে দৌড় শুরু করবে এবং যে খো দিল সে পূর্ববর্তী খেলোয়াড় যে দিকে মুখ করে বসেছিল সেই দিকে মুখ করে বসবে। 'ক' দলের ঐ খেলোয়াড় 'খ' দলের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে মোর করবার চেষ্টা করে ফিরে এসে আবার অন্য যে কোন একজনকে 'খো' দিলে সঙ্গে সঙ্গে সে খেলতে চেষ্টা করবে। এই ভাবে ঘন ঘন 'খো' দিয়ে খেলাটি বেশ জমে উঠবে। 'ক' দলের খেলোয়াড় 'খ' দলের যে খেলোয়াড়কে ছোবে সেই মোর হবে।

দুই দল নিয়ে এই খেলা হয়। একদল আক্রমণকারী আর অপর দল পলায়নকারী। এ ক্ষেত্রে 'ক' দল আক্রমণকারী এবং 'খ' দল পলায়নকারী। পলায়নকারী দল আক্রমণকারী 'ক' দলের লাইনের ভেতর দিয়ে যেতে পারবে কিন্তু আক্রামণকারী দল লাইনের ভেতর দিয়ে যেতে পারবে না কিংবা লাইনের কিছুদূর গিয়ে ফিরতে পারবে না, লাইনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে তবে ফিরতে পারবে। তেমনি অবশ্য পলায়নকারী 'খ' দলের কোন খেলোয়াড় ঘরের বাইরে গেলে সে মোর হবে। যে মোর হবে সে বসে পড়বে।

এমনি করে একটি দলের সকলে মোর হলে দল স্থান বদল করবে। আক্রমণকারী দল পলায়নকারী দলে রূপ নেবে। পলায়নকারী দল আক্রমণকারী দলে রূপ নেবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেলা হলে সেই সময়ের মধ্যে যে দল অন্য দলকে বেশী বার মোর করতে পারবে তাদের জয় হবে।

তিন ঃ হা-ডু-ডু

হা-ডু-ডু একসময় খুবই জনপ্রিয় খেলা ছিল। ইহা ভারতের জাতীয় খেলা। আধুনিক কালে ফুটবল খুব জনপ্রিয় হওয়ায় হাডুডু-র প্রচলন কমে গেছে। হা-ডু-ডু খেলা খুব চিত্তাকর্ষক খেলা। চারপাশে দাগটানা একটা নির্দিষ্ট ঘরের ভেতরে এই খেলা খেলতে হয়। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা দাগ টানা থাকবে। দাগের দু পাশে দু দল দাড়াবে। একদলের

একজন এক নিঃশ্বাসে অপর দলের ঘরে ঢুকে তেড়ে গিয়ে কাউকে ছুয়ে আসতে পারলে সে ছোঁয়া পড়বে। তাকে বসে পড়তে হবে। কিন্তু সে ছুতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যায়, তবে তাকেই
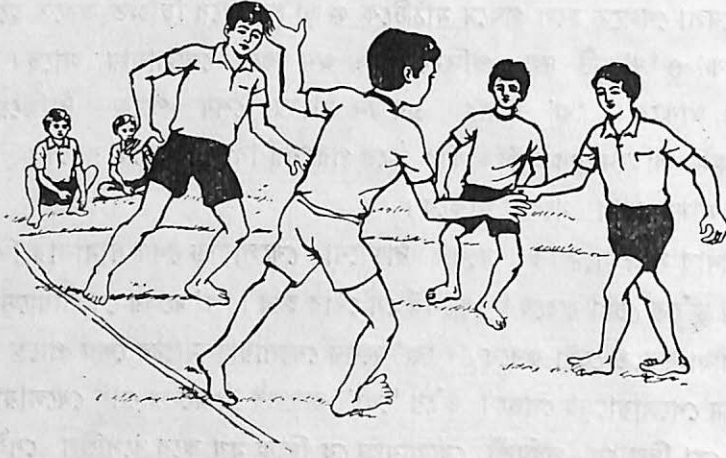
বসে পড়তে হবে। এভাবে ছোঁয়া ও ধরার মাধ্যমে এই খেলা চলে। যে দলের সব ছোঁয়া কিংবা ধরা পড়বে সেই দলই হারবে। সাধারণত পা দিয়ে, কেচকি দিয়ে, শুয়ে পড়ে পা জড়িয়ে ধরতে হয়। হাতে ধরলে ছিটকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় গোল হয়ে ঘিরে ফেলে ধরে ফেলা যায়। যতক্ষণ নিশ্বাস থাকবে ততক্ষণ সে পালাবার চেষ্টা করতে পারবে। এই খেলা খেলতেও মজা, দেখতেও মজা।

প্রশ্নঃ এই খেলা থেকে কি উপকার হয় ?

উত্তরঃ। নিশ্বাস প্রশ্বাসের জোর বাড়ে, সর্বাঙ্গের ব্যায়াম হয়। গায়ে শক্তি বৃদ্ধি হয়। ক্ষিপ্র গতিতে দৌড় ও ধরা ছোঁয়ার-নানা কৌশল শেখা যায়।

চারঃ ফুটবল

ইতালির জনগণ এই খেলা প্রথম শুরু করেন। আমাদের দেশে ইংরেজরা এই খেলা প্রথম শুরু করেন। এখন এই খেলা আমাদের খুব জনপ্রিয় খেলা। ফুটবল চামড়া দিয়ে তৈরী। চামড়ার থলের ভেতরে রবারের ব্লাডার থাকে। হাওয়া দিয়ে এই ব্লাডারকে ফোলানো হয়। তখন ফুটবল গোলাকার হয়। তারপর পা দিয়ে খেলতে হয়।

ফুটবল মাঠ সাধারণতঃ ১২০ গজ লম্বা এবং ৮০ গজ চওড়া হয়ে থাকে। দু'দলে খেলতে হয়। একএক দলে এগারোজন করে খেলে। ছোটরা একএক দলে সাত জন বা নয় জন করেও খেলতে পারে।

মাঠের দুপাশের শেষ প্রান্তে দুটি গোল পোষ্ট থাকে। খেলা যিনি পরিচালনা করেন তার

নাম রেফারী। মাঠের দু পাশে দু'জন লাইন্‌স্‌ম্যান। মাঝমাঠ থেকে খেলা শুরু হয়। বল মাঠের মাঝখানে সেণ্টারে থাকে। রেফারী বাঁশী বাজানো মাত্র খেলা শুরু হয়ে যায়। সাধারণত ফরোয়ার্ড, স্টপার, ব্যাক, গোলকিপার এই নিয়মে খেলা হয়ে থাকে। দুই দলই প্রতিপক্ষের মধ্যে দিয়ে বল ঠেলে নিয়ে গোল করার জন্য চেষ্টা করে। বল নিয়ে এগোনার সময় নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। গোলরক্ষক হাত, বা, মাথা, বা বসে পড়ে, কখনও শুয়ে পড়ে বল ধরার চেষ্টা করে। সে যে কোনভাবে বল আটকাতে পারবে কিন্তু অন্যান্য খেলোয়াড়রা হাত দিয়ে বল ধরতে পারবে না। তাদের হাতে বল লাগলে 'হ্যাণ্ড বল' হবে। তখন খেলা বন্ধ হয়ে অপর দলে ফ্রী কিক্ হবে। কোনো খেলোয়াড়কে বে-আইনী ভাবে আঘাত করলে বা খেলতে খেলতে ধাক্কা দিলে 'ফাউল' হয়। মাঠের নির্দিষ্ট সীমা রেখার বাইরে বল চলে গেলে আউট ধরা হয়। তখন 'থ্রো' করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে দল বেশী গোল করতে পারবে, সে দলই জয়ী হবে। দুই দলের সমান সংখ্যক গোল হলে কিম্বা কোনো দলই কোনো গোল করতে না পারলে খেলা 'ড্র' হয়।

প্রশ্ন ঃ এই খেলার উপকারিতা কি ?

উত্তর ঃ শরীর গঠনের পক্ষে এই খেলা উৎকৃষ্ট। কারণ এই খেলার মাধ্যমে শরীরের সর্বাঙ্গের ব্যায়াম হয়। এই খেলা থেকে সহযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা বোধ ও ঐক্য প্রভৃতি গুণাবলী-শিশুরা লাভ করতে পারে।

পাঁচ। ক্রিকেট

এই খেলা শিশুদের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই বিশদভাবে আলোচনা করা হলো না। তবে আজকাল এই ক্রিকেট খেলাও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শীতকালে অনেক জায়গায় শিশুরাও এই খেলা খেলে থাকে। এই খেলা এক সময় বড়দের ছিল। এখন ছোটরাও খেলতে শুরু করেছে।

দু দলের মধ্যে এই খেলা হয়ে থাকে। একদল ব্যাট করে, তখন আর একদল ফীল্ডিং দেয়। এগারো জন করে প্রতিদলে খেলোয়াড় থাকে। এই খেলা যে পরিচালনা করে, তাঁকে আম্পায়ার বলে। মাঠের মাঝামাঝি এই খেলা হয়ে থাকে। একদিকে ২।৩ ইঞ্চি তফাতে তিনটি কাঠি পোতা

হয়। এইগুলিকে উইকেট বলে। এই উইকেটের সামনে ২ ফুট দূরে একজন ব্যাট নিয়ে দাঁড়ায়। সে বল মারে। তাকে ঘিরে মাঠের চারদিকে ফীল্ডিং দিতে অপরপক্ষের খেলোয়াড়রা দাঁড়ায়। উইকেটের ঠিক পেছনে যে থাকে তাকে উইকেট কিপার বলে। মাঠের অপর প্রান্তেও তিনটি উইকেট থাকে। সেখান থেকে একজন বল ছোঁড়ে। প্রত্যেক খেলোয়ার ছয়টি করে বল করে। নানারকমভাবে ব্যাট্‌স্ম্যান আউট হয়ে থাকে। বল উইকেটে লাগলে ব্যাট্‌স্ম্যান আউট হবে, ব্যাট্‌স্ম্যানের বল কেউ লুফে নিলে আউট হবে, রান করার সময় উইকেটে বল লাগাতে পারলে ব্যাট্‌স্ম্যান আউট হবে, ও বল মারার সময় বাঁ পায়ে বল লাগলে আউট হবে! ব্যাট্‌স্ম্যানের মারা বল যদি গড়াতে গড়াতে সীমানা পার হয়ে যায় তাহলে বাউণ্ডারি হবে। যদি শূন্যের উপর দিয়ে সীমানা পার হয়ে যায় তাহলে ওভার বাউণ্ডারি হবে।

বল ছোঁড়া ও বল মারা এই খেলার বৈশিষ্ট্য। ভালো বল ও ভালো ব্যাট করে প্রতিপক্ষ দলকে পরাজিত করা যায়। যে দল বেশী সংখ্যক রান তুলতে পারবে সেই দল জয়ী হবে।

১। কিভাবে 'চোর পুলিশ' খেলবে?

২। 'কানামাছি' খেলাটি নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও?

৩। 'দাঁড়িয়াবান্দা খেলা' থেকে শিশুরা কি শিখতে পারে?

৪। 'হা-ডু-ডু' খেলা থেকে কি উপকার হয়?

৫। রেফারী কাকে বলে?

৬। ফুটবল প্রথম কোথায় শুরু হয়? আমাদের দেশে কারা ফুটবল খেলা শুরু করে?

৭। ফুটবল মাঠ কত বড় এবং কতজন খেলে?

৮। গোলকিপার কাকে বলে?

৯। ফুটবল খেলার উপকারিতা কি?

১০। আম্পায়ার কাকে বলে?

১১। এক একটি খেলোয়াড় একনাগাড়ে কয়টা বল করতে পারে?

১২। উইকেট কিপার কাকে বলে?

১৩। বাউণ্ডারি, ওভার বাউণ্ডারি কাকে বলে?

ব্রতচারী

ব্রতচারী আন্দোলনের স্রষ্টা ঁগুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাঙালীদের বিলাসিতা ও কর্ম বিমুখতায় ভীষণ-ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি বাঙালী ছেলেমেয়েদের আনন্দের মধ্য দিয়ে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগান ও গ্রামে গঞ্জে বাংলার সঠিক মান উন্নয়নের জন্য বাংলায় ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন।

বাংলা মায়েয় তুই সন্তান হিন্দু-মুসলমান যাতে একসাথে নিজেদের একই সূত্রে গেঁথে বাংলা মায়ের মান উন্নয়নের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারে সেই দিকে লক্ষ রেখে তিনি গান রচনা করেছিলেন। প্রার্থনার মধ্য দিয়েই ব্রতচারীর সূত্রপাত করা হয়।

ভগবান হে, খোদা তালা হে,
জয় জয় হে তব জয় জয় হে।
তুমি কর সবে সম স্নেহ দান হে,
জয় জয় হে তব জয় জয় হে,
জয় জয় হে তব জয় হে।
নহ বিভু তুমি কভু ভিন্ন হে
জগৎ জুড়িয়া তার চিহ্ন হে,

দেহ প্রেম ভক্তি জ্ঞান হে,
মোহ হতে কর ত্রাণ হে।
কর ত্রাণ হে কর ত্রাণ হে
জয় জয় হে তব জয় জয় হে।
সকলের সাথে কর মুক্ত হে
কর হিংসা কলহ হতে মুক্ত হে
কর মুক্ত হে কর মুক্ত হে
জয় জয় হে তব জয় হে।

বৃত্তাকারে হাঁটুর উপর ভর করে বসে জোর হাতে "ভগবান হে" বলার পর হাত খুলে সেদিকে তাকাতে হবে, তারপর সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে মাথার উপরে তু'হাত তুলে "জয় জয় হে" বলতে হবে। "তুমি কর সবে" দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে দেখাতে হবে।

"নহ বিভু তুমি কভু" বলার সময় বুকের সামনের দিকে হাত তুটি প্রসারিত করে বাঁকাবে এবং "জগৎ জুড়িয়া" গাইবার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথার উপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নীচে নামাবে।
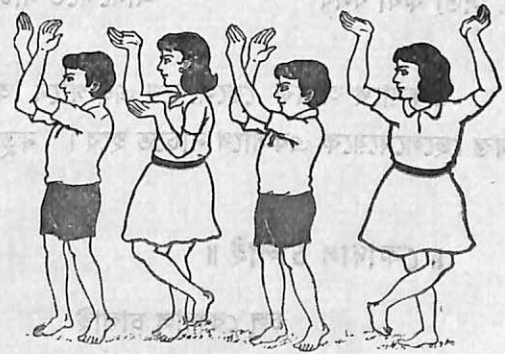
"দেহ প্রেম ভক্তি" গাইবার সময় প্রার্থনার মত হাত জোড় করবে এবং উপরের দিকে তাকাবে। "কর ত্রাণ হে" গাইবার সময় মুষ্টিবদ্ধ হাত তুটি তুদিকে সজোরে প্রসারিত করবে। "জয় জয় হে"

গাইবার সময় মাথার উপরে দু'হাত তুলে দেখাবে। "সকলের সাথে কর যুক্ত হে" গাইবার সময় সকলে হাতে হাত মেলাবে, "কর হিংসা কলহ হতে মুক্ত হে" গাইবার সময় মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি সজোরে প্রসারিত করবে।

॥ ব্রতচারীদের পঞ্চব্রত ॥

(১) জ্ঞানব্রত, (২) শ্রমব্রত, (৩) সত্যব্রত, (৪) ঐক্যব্রত, (৫) আনন্দব্রত। সংক্ষেপে বলে—জ্ঞাশ্র স ঐ আ। বারবার কথাগুলো পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলবে। তারপর বৃত্তাকারে দাঁড়ানোর পর বুকে ডান হাত দিয়ে প্রতিটি পদের কথা স্মরণ করে ডান হাত উঁচু করে তুলবে। শেষে সবাই মিলে হাততালি দিয়ে "জ্ঞাশ্র স ঐ আ" বলবে।

॥ ব্রতচারীর বারো পণ ॥

ছুটব খেলব হাসব সত্য পথে চলব

সবায় ভালো বাসবো হাতে জিনিস গড়ব

গুরুজনকে মানব শক্ত শরীর করব

লিখব পড়ব জানব দলের হয়ে লড়ব

জীবে দয়া দানব গায়ে খেঁটে বাঁচব

সত্য কথা বলব আনন্দেতে নাচব

একসাথে অনেক ছেলেমেয়ে এই গানে অংশ নিতে পারবে। গানের তালে তালে তাল মিলিয়ে সমস্ত ছেলেমেয়েকে একসাথে নাচতে হবে। নতুবা তাল কেটে যাবে। ছন্দ পতন ঘটবে।

॥ কোদাল চালাই ॥

চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মনের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ হবে শরীর ঝালাই
যত ব্যাধির বালাই বলবে পালাই পালাই
পেটের ক্ষীধের জ্বালায় খাবো ক্ষীর আর মালাই ॥

খুব উদ্দীপনাময় ব্রতচারী গান। অনেকের মুখে মুখে এই গানটার খুব প্রচলন আছে। এই গানটা গেয়ে নাচবার আগে সকল ছেলেমেয়েকে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে হবে। বৃত্তাকারে দাঁড়ানোব পর ডানদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গান গাইতে গাইতে 'কোদাল চালাই' বলবে।

॥ বাংলা ভূমির গান ॥

আমরা বাঙালী সবাই বাংলা মার সন্তান
বাংলা ভূমির জল হাওয়ায় তৈরী মোদের প্রাণ,
মোদের দেহ, মোদের ভাষা, মোদের নাচ আর গান
বাংলা ভূমির মাটি হাওয়ায় জলেতে নির্মাণ ॥
বাংলা ভূমির প্রেমে মোদের ধর্ম আর ইমান
বাংলা ভূমি মোদের কাছে স্বর্গসম স্থান।
বাংলা ভূমির ছন্দ ধারায় পালন করে মান
দানবো মোরা বিশ্বে মোদের বিশিষ্টতম দান।

ব্রতচারীর এই গানটিও খুব প্রচলিত। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বৃত্তাকারে পরস্পর হাত ধরাধরি করে প্রথম দাঁড়াবে। তারপর পায়ের পাতার আঙ্গুলের ওপর ভর করে আটটি তালে তাল মিলিয়ে হাত ধরা অবস্থায় কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আবার পরমুহূর্তে নিজের জায়গায় ফিরে আসতে হবে।

॥ সারি গান ॥

কাউয়ায় ধান খাইলরে খেদানের মানুষ নাই
খাবার বেলায় আছে মানুষ কামের বেলায় নাই ॥
হাত পা থাকিতে তোরা অবশ হইয়া রইলি
কাউয়া না খেদাইয়া তোরা খাইবারে বসিলি।
ও পাড়াতে পাটা নাই পুতা নাই মরিচ বাটে গালে
তারা খাইল তাড়াতাড়ি আমরা মরি ঝালে।
আরে হিঁয়ো হিঁয়ো হিঁয়ো। (তিনবার)

এটা ব্রতচারী গান হলেও গ্রাম বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় (বাংলা দেশ) এই গানটির খুব প্রচলন আছে। অনেক ছেলে মেয়ে মাঠে ঘাটে এই গানটি গেয়ে থাকে। এই গানটি গাইবার সময় কেন্দ্রের দিকে পা মেলে বৃত্তাকারে বসবে এবং মাথা পিছু করে দাঁড় টানবার ভঙ্গী করবে।

॥ কাঠি নাচ ॥

অনেক ব্রতচারী নৃত্যের মধ্যে এই 'কাঠি নাচ' নৃত্য খেলাটি সবচেয়ে বেশী আনন্দ দায়ক। এই খেলায় ছেলে মেয়েরা খুব উৎসাহ পায়। এতে জোড় সংখ্যার ছেলে মেয়ের প্রয়োজন হয়। ১।২ করে

করে জোড় সংখ্যক ছেলে মেয়ে আবশ্যক। জোড় জোড় করে ঠিক করে নিতে হয়। প্রত্যেকের দু'হাতে এক হাত লম্বা করে দুটো লাঠি থাকবে। ১২।১৪ জন থেকে ৩০।৪০ জন্য পর্যন্ত একসঙ্গে কাঠিনাচ
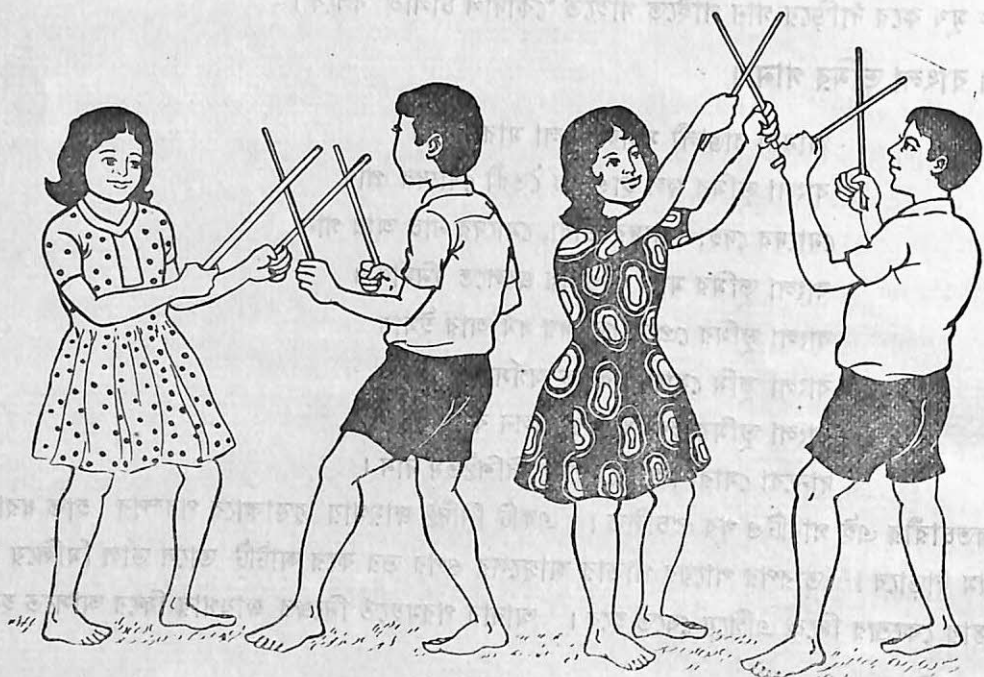
খেলতে পারে। কাঠিনাচ চারটি তালের সমন্বয়ে করা হয়। যেমন একের মার দু-এর ঠেকা এবং দু-এর মার একের ঠেকা। অর্থাৎ এক বললে ১নং ব্রতচারী বামদিকে ঘুরে ডান হাতের কাঠি তুলে ২নং কে আঘাত হানতে চেষ্টা করবে, তখন ২নং ব্রতচারী বামদিকে ঘুরে তার বাম হাতের কাঠি দিয়ে আঘাত ঠেকিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
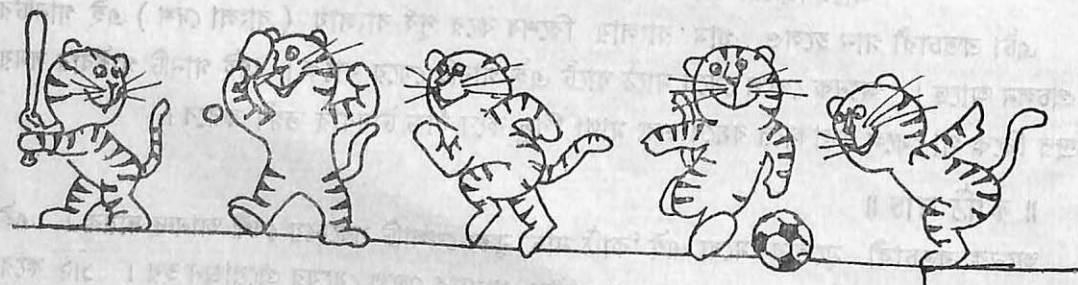
প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

শরীর ও মনের সুস্থ অবস্থাকেই স্বাস্থ্য বলে। মনকে প্রফুল্ল রাখা, মনকে চিন্তার উপযোগী ও শরীরকে কাজকর্ম করার উপযোগী করে রাখাই হল স্বাস্থ্যেই মূল কথা।

মন আর দেহ নিয়েই হল মানুষ। দেহ খারাপ থাকলে, রুগ্ন থাকলে মন ভালো থাকে না। কোন কাজে মন বসে না। কাজ করাও যায় না। আবার দেহ ভালো থাকলে, সুস্থ থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে। কাজ করার স্পৃহা বাড়ে।

শরীর ভালো না থাকলে কোন কাজ কর্ম করতে ভালো লাগে না। জীবনে সুখী হওয়া যায় না। উন্নতি লাভ করা যায় না। তাই সবার আগে শরীরকে সুস্থ, সবল ও নীরোগ রাখা প্রয়োজন। সেই জন্য স্বাস্থ্যকেই সকল সুখের মূল কথা বলা হয়।

কথায় বলে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। নীরোগ শরীর জীবনের সকল সুখ ও শান্তির মূল।

কি করলে শরীর সুস্থ রাখা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে স্বাস্থ্য রক্ষার সমস্ত নিয়মগুলো ঠিকভাবে পালন করা দরকার। ঠিক সময় ঘুমনো, ঠিক সময় ঘুম থেকে ওঠা, নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগ করা, দাঁত মাজা, স্নান করা, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা, ঠিক সময়ে পরিমাণ মত খাবার খাওয়া, বাসী-পচা খাবার না খাওয়া, অসময়ে না খাওয়া এবং ঠিক সময়ে খেলাধূলা ও ব্যায়াম চর্চা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষা করাও দরকার। বহুলোককে নিয়েই আমাদের সমাজ। যে ব্যবস্থার দ্বারা বহুলোকের স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার ব্যবস্থা করা হয়, তাকেই সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা বলা হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে কি হয়?

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে ধুলো-ময়লা জমে। এই ধুলো-ময়লায় নানা রোগের জীবাণু থাকে। দেহকে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে নানাবিধ রোগ হয়।

নিয়মিত স্নান করার উপকারিতা কি ?

নিয়মিত স্নান করলে লোমকূপের গোড়াগুলি পরিষ্কার থাকে। প্রতিদিন স্নান করলে শরীর ঠাণ্ডা থাকে এবং রাতে ভালো ঘুম হয়।

শরীরকে পরিষ্কার রাখার জন্যই নিয়মিত স্নানের প্রয়োজন। শরীরের লোমকূপ দিয়ে ঘামের মাধ্যমে শরীরের অ প্র য়ো জ নী য় জিনিস বের হয়ে যায়। ময়লা জমলে দেহের লোমকূপগুলোর গোড়া বন্ধ হয়ে যায়।

হাত-পা-মুখ ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা কি ?

যখনই হোক, বাইরে বেরোলে হাতে, পায়ে, মুখে ধূলো বালি লেগে যায়। বাইরের বাতাসে, পথের ধূলায় নানা রোগ জীবাণু থাকে। সব সময় সকলের পক্ষে স্নান করে ঘরে প্রবেশ করা সম্ভব নয় ; বারবার স্নান করাও উচিত নয়। তাই বাইরে থেকে ঘুরে এলে হাত পা মুখ ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। তাছাড়া খেতে বসার আগে হাত পা মুখ ধুয়ে বসতে হয়। তা না হলে রোগের জীবাণু খাদ্যের সঙ্গে মিশে আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
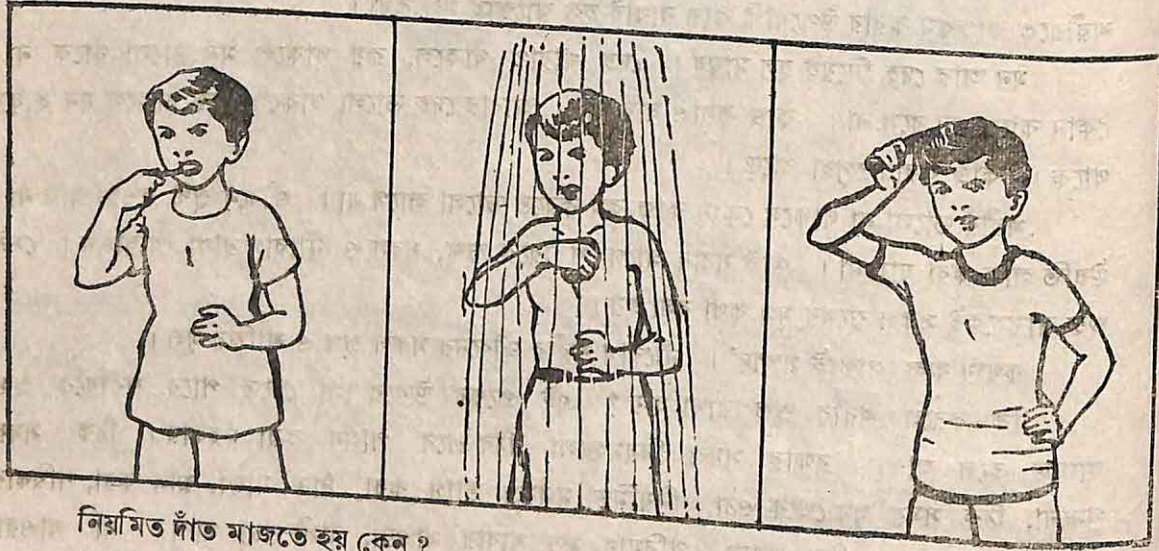
নিয়মিত দাঁত মাজতে হয় কেন ?

নিয়মিত দাঁত না মাজলে দাঁতে পোকা ধরে, যন্ত্রণা হয়, মুখ থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরোয়। দাঁত না মাজলে মাড়িতেও রোগ হয়। এছাড়া দাঁত না মাজলে দাঁতের ময়লা খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে পেটে যায় এবং নানা রোগের সৃষ্টি করে।

দাঁত আমাদের কি কি কাজ করে ?

আমরা যে সব জিনিস খাই, তা যদি তরল না হয়ে শক্ত হয়, তাহলে দাঁত দিয়ে সে সব খাদ্যদ্রব্য খণ্ড বিখণ্ড করে পেষণ করা হয়। তাতে খাদ্য দ্রব্য সহজে খাওয়া যায় এবং হজম হতে সহায়তা করে। তাছাড়া সুন্দর দাঁত মুখের শোভা বর্ধণ করে।

কান কি ভাবে পরিষ্কার রাখবে ?

প্রতিদিন স্নানের আগে কানে সরষের তেল দিতে হয়। তাতে কানের মধ্যে ময়লা জমতে পারে না। কানে খল জমলে কান খুসকি দিয়ে কানের ভেতর পরিষ্কার করবে। কান নিজে পরিষ্কার না করে ডাক্তারের সাহায্যে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করালে কানের কোন অসুখ হবে না।

চুল পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা কি ?

বাইরে ধুলো বালি হাওয়ার সাথে নিয়মিত মাথার উপর এসে পড়ছে। এতে চুলের ভেতরে ময়লা জমে। এই ময়লা পরিষ্কার না করলে চুলের গোড়ায় খুসকি ও উকুন জন্মায় এবং মাথায় নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

নখ কাটা দরকার কেন ?

আঙ্‌ুলের নখ প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়ে। নখ বড় হলে নখের ভেতর ময়লা জমে এবং সেই ময়লায় রোগের জীবাণু থাকে। সেই রোগজীবাণু খাবার সময় খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মিশে আমাদের পেটে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে। তাই নখ একটু বড় হলেই সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলতে হয়। তা নাহলে নখের ভেতর ময়লা জমে। কাজেই সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন নখ কাটবে।

মল-মূত্র কি ?

দেহের ভেতরের ময়লা জিনিস। খাদ্য ও পানীয়ের অসার অংশ মল-মূত্র হয়ে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে।

নিয়মিত মল-মূত্র ত্যাগের উপকারিতা কি ?

নিয়মিত মল-মূত্র ত্যাগে শরীর ও মন সতেজ থাকে। দেহ ও মন ভালো থাকে। কাজের উদ্যমতা বাড়ে। ক্ষিধে পায়, ভালো ঘুমও হয়।

(১) স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝ ? (২) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝ ? (৩) "স্বাস্থ্যই সম্পদ" এ কথার অর্থ কি ? (৪) স্বাস্থ্য কি টাকা দিয়ে কেনা যায় ? (৫) স্বাস্থ্য-রক্ষা কি ভাবে করা যায় ? (৬) সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষা কি ? (৭) প্রতিদিন স্নান করা প্রয়োজন কেন ? (৮) নিয়মিত দাঁত মাজা উচিত কেন ? (৯) কান পরিষ্কার রাখা উচিত কেন ? (১০) নিয়মিত চুল আঁচড়ানো কেন দরকার ? (১১) হাত-পা কেন ধোওয়া দরকার ? (১২) মল-মূত্র কি ? (১৩) নিয়মিত মল-মূত্র ত্যাগের উপকারিতা কি ?

বদ অভ্যাস

বদ অভ্যাস কি বা কাকে বলে ?

সাধারণতঃ যে অভ্যাসের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় বা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, তাকে বদ অভ্যাস বলে।

কতকগুলো বদ অভ্যাসের নাম কর।

পেন্সিলের সীস মুখে দেওয়া, থুতু দিয়ে শ্লেট মোছা, জিভে আঙ্গুল দিয়ে বই এর পাতা উল্টানো, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করা বা পায়খানা করা, যেখানে

সেখানে থুতু কফ ফেলা, জামা কাপড় বা দেওয়ালে শিকনি মোছা, জামা কাপড় নোংরা করে রাখা বা পরা, স্নান না করা, জুতা না খুলে বা ময়লা পায়ে ঘরে ঢোকা প্রভৃতি বদ অভ্যাস।

কোথায় থুতু ফেলবে ?
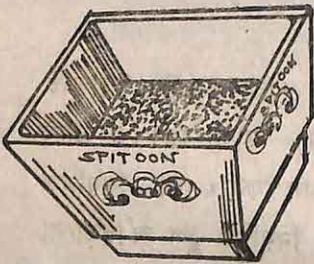
বাড়ির একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থুতু ফেলা উচিত। যেখানে সেখানে থুতু ফেলবে না। থুতু থেকে নানা রোগ ছড়ায়। থুতু থেকে নানা রকম রোগ হবার ভয় থাকে। থুতু হাওয়ায় শুকিয়ে তার রোগ জীবাণু ভাসতে ভাসতে আমাদের খাবারে এসে পড়ে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গিয়ে নানা রোগের সৃষ্টি করতে পারে। থুতুর উপর মাছি বসলে মাছির গায়ে থুতু লেগে যায়। সেই মাছি উড়ে এসে খাদ্যের উপর বসে।

জল

আমরা জলপান করি কেন ?

আমরা সাধারণতঃ যে সব খাদ্য খাই, জল সেগুলিকে তরল করে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। হজম হতে সাহায্য করে। জল শরীর ঠাণ্ডা রাখে। দেহের ভেতরের ময়লা ঘাম ও মূত্রের সঙ্গে বের করে দেয়। এই জন্য আমরা জল পান করি।

জলের আর এক নাম 'জীবন' কেন ?

জল জীবের ভীষণ প্রয়োজন। জল ছাড়া মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা জীবজন্তু, কেউই বাঁচতে পারে না। সেজন্য জলের আর এক নাম জীবন।

জল আমাদের শরীরের কি উপকার করে ?

জল শরীর সতেজ রাখে। জল আমাদের শরীরের রক্ত চলাচলে সাহায্য করে। শরীর ঠাণ্ডা রাখে।

জল পান করা ছাড়া মানুষের আর কি কি কারণে দরকার ?

জল পান করা ছাড়া স্নান করা, রান্না, বাসন ধোওয়া, হাত মুখ ধোওয়া ও জামা কাপড় পরিস্কার করার জন্য জল দরকার।

কিরূপ জল পান করা উচিত ?

বিশুদ্ধ জল পান করা উচিত।

জল পান করার সাধারণ নিয়ম কি ?

পরিশ্রান্ত অবস্থায় জল পান করতে নেই। প্রখর রোদে ঘুরে এসে তৎক্ষণাৎ জল পান করতে নেই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিয়ে পরে জল পান করা উচিত। রাত্রে শোবার সময় ও ঘুম থেকে উঠে জল পান করা উচিত। আহারের আধঘন্টা পরে জল পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

পুকুরের জল দূষিত হয় কেন ?

স্নান করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, গরু-বাছুরের গা ধোয়ান ইত্যাদি কারণে পুকুরের জল দূষিত হয়। তাছাড়া পুকুরের চারপাশে যে সব গাছ পালা থাকে তার পাতা খসে পড়ে পঁচে জল দূষিত হয়।

প্রতিদিন কতটা পরিমাণ জল পান করা উচিত ?

সারাদিনে ২।৩ লিটার জল অন্ততঃ পান করা উচিত।

দূষিত জলে কি কি রোগের জীবাণু থাকে ?

দূষিত জলে কলেরা, আমাশা, টাইফয়েড, বদহজম প্রভৃতি রোগের জীবাণু থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

১। বদ অভ্যাস কি বা কাকে বলে ?

২। কতগুলো বদ অভ্যাসের নাম কর ?

৩। থুতু কোথায় ফেলা উচিত ? এবং কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

(১) জল আমাদের শরীরের কি উপকার করে ?

(২) জলের আর এক নাম 'জীবন' কেন ?

(৩) পান করা ছাড়া আর কি কি কারণে জলের দরকার হয় ?

(৪) দূষিত জলে কি কি রোগের জীবাণু থাকে ?

(৫) কি পরিমাণ জল পান করা উচিত ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খাদ্য

খাদ্য কাকে বলে ?

শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য আমরা যে সকল জিনিস খাই তাকে খাদ্য বলে।

আমরা খাদ্য গ্রহণ করি কেন ?

বাঁচতে হলে খেতেই হবে। শরীরের পুষ্টি ও ক্ষয়পূরণের জন্য আমরা খাদ্য খাই। খাদ্য দেহের তাপ ও শক্তি জোগায়। খাদ্য দেহের গঠন বৃদ্ধি করে। খাদ্য ক্ষুধার নিবৃত্তি সাধন করে।

খাদ্যকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায় ও কি কি ?

খাদ্যকে ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—(১) আমিষ জাতীয় খাদ্য, (২) শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, (৩) স্নেহ জাতীয় খাদ্য, (৪) লবণ জাতীয় খাদ্য, (৫) ভিটামিন জাতীয় খাদ্য ও (৬) জল জাতীয় খাদ্য।

আমিষ জাতীয় খাদ্য কাকে বলে ? এর গুণ কি ?

মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য। ইহা শরীরের ক্ষয়পূরণে ও পুষ্টি সাধনে বিশেষ সাহায্য করে।
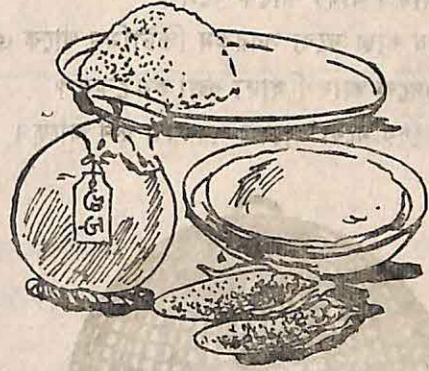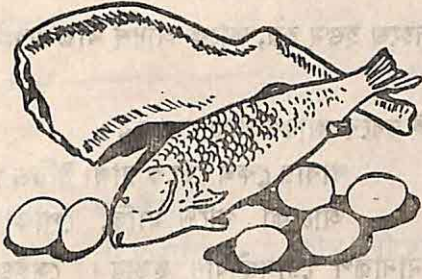
শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্য কাকে বলে ? এর গুণ কি ?

চাল, আটা, ময়দা, চিনি, গুড়, ডাল, সাগু, বার্লি, ভুট্টা, আখ প্রভৃতি শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্য। এরূপ খাদ্য শরীরের তাপ ও কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

স্নেহ জাতীয় খাদ্য কাকে বলে ? এর গুণ কি ?

দুধ, ঘি, মাখন, তেল, চিনাবাদাম, আখরোট, নারিকেল প্রভৃতি স্নেহ জাতীয় খাদ্য। শরীরের তাপ রক্ষা ও শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করে।

লবণ জাতীয় খাদ্য কাকে বলে ? এর গুণ কি ?

লবণ, লৌহ, ক্যালসিয়ামকে লবণ জাতীয় খাদ্য বলে। এই জাতীয় খাদ্য দেহের রক্ত পরিষ্কার করে।

ভিটামিন জাতীয় খাদ্য কাকে বলে ? এর গুণ কি ?

যে সব খাদ্যে ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ বর্তমান, এরূপ খাদ্যকেই ভিটামিন জাতীয় খাদ্য বলা হয়। প্রায় সকল প্রকার খাদ্যেই কমবেশী ভিটামিন থাকে। বাঁধাকপি, কমলালেবু, অঙ্কুরিত ছোলা, পালংশাক, টম্যাটো, ডিম, টাট্‌কা ফলমূল ও শাক সব্‌জিতে পরিমাণ মত ভিটামিন থাকে। ভিটামিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়।

জল জাতীয় খাদ্য কাকে বলে ? এর গুণ কি।

পানীয় জল, শাকসব্‌জী, ফলমূল হলো জল জাতীয় খাদ্য। উহা আমাদের তরল ও কঠিন খাদ্য দ্রব্য হজমে সাহায্য করে এবং দেহের দূষিত পদার্থ ঘাম ও মলমূত্রাকারে বের করে দেয়।

খাদ্য না খেলে কি হয় ?

খাদ্য না খেলে শরীরের পুষ্টি হয় না, শরীর দুর্বল হয়, এমন কি অনেক দিন না খেয়ে থাকলে মৃত্যু হয়।

আমাদের প্রতিদিন কিরূপ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত ?

আমিষ, শ্বেতসার ও ভিটামিন জাতীয় খাদ্য আমাদের প্রতিদিনই পরিমাণ মত খাওয়া দরকার। সকল সময় টাট্কা ও ভাল খাদ্য খাওয়া উচিত। কখনও বাসি বা পচা খাদ্য খাওয়া উচিত নয়।

আদর্শ খাদ্য কাকে বলে ?

যে খাদ্য দ্রব্যে সবরকম ভিটামিন থাকে এবং সহজে হজম হয়, তাকে আদর্শ খাদ্য বলে।

দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয় কেন ?

দুধের মধ্যে খাদ্যের সবরকম গুণ আছে। তাই দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়।

খাবার কেন ঢেকে রাখা উচিত ?

আঢাকা খাদ্যে মাছি, পোকামাকড় বসে নানারূপ রোগজীবাণু ছড়ায়। সেইজন্য আঢাকা খাবার খাওয়া উচিত নয়। বাতাসের ধুলো-বালিতেও জীবাণু থাকে।

কি রকম 'খাদ্য' খেতে হয় ?

সব সময় টাটকা খাদ্য খাওয়া উচিত। বাসি, পচা কখনও খেতে নেই। খোলা খাবার কখনও খাবে না। কারণ খোলা খাবারে ধুলো বালি পড়ে মাছি বসে রোগ জীবাণু মিশে যেতে পারে।

অসুস্থ ব্যক্তির খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত ?

ডাক্তারের মতামত নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে খাদ্য দিতে হয়। সাধারণতঃ বার্লি, দুধ, সাগু, ঘোল, মাছ ও মাংসের জুস, ডাবের জল, ডিমের পোচ্, তরকারী সিদ্ধ ইত্যাদি খাদ্য অসুস্থ ব্যক্তিকে খেতে দেওয়া ভাল।
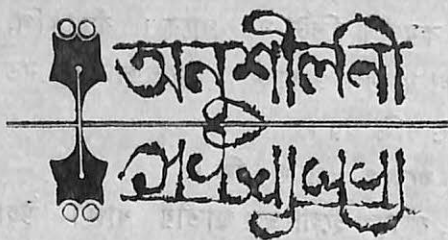
(১) খাদ্য কাকে বলে ? (২) খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কেন ? (৩) আমরা সাধারণতঃ কি কি খাদ্য খেয়ে থাকি ? (৪) খাদ্য দেহের কি কি কাজ করে ? (৫) খাদ্য কয়প্রকার ও কি কি ? (৬) কি কি খাদ্যে ভিটামিন আছে ? (৭) দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয় কেন ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্বাস-প্রশ্বাস ও আলো বাতাস

শ্বাস-প্রশ্বাস কাকে বলে ?

নাকের ছিদ্র দিয়ে বাইরের যে বায়ু শরীরের ভিতর ঢুকছে, তাকে বলে "প্রশ্বাস"। সেই বায়ু যখন বের হয়ে যায় তখন তার নাম "নিশ্বাস"। এই দুই কাজকে শ্বাস-প্রশ্বাস বলে।

শ্বাস প্রশ্বাস কিভাবে গ্রহণ করা উচিত ?

সর্দি-কাশি হলে অনেক সময় আমরা মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি। কিন্তু ইহা শরীরের পক্ষে খুবই খারাপ। কারণ, তাতে বাইরের অনেক দূষিত পদার্থ মুখ দিয়ে শরীরে ঢুকে যেতে পারে। নাকের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে বাইরের দূষিত পদার্থ নাকের জালে আটকিয়ে যায়। দূষিত পদার্থ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

বিশুদ্ধ বায়ু কোথায় মেলে ?

ফাঁকা মাঠে, সমুদ্রের তীরে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের উপকারিতা কি ?

সূর্যের কিরণে বায়ু নির্মল ও বিশুদ্ধ হয়। সকাল বিকাল ফাঁকা মাঠে কিংবা নদী বা সমুদ্রের ধারে বিশুদ্ধ বায়ুর সেবন করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাসে শরীরের কি হয় ?

শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে বাইরের বিশুদ্ধ বায়ু শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। শরীর ভাল থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই আমরা বেঁচে আছি। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হলে সকল প্রাণীই মারা যায়।

সূর্যের কিরণে আমাদের কি উপকার হয় ?

সূর্যের কিরণে বেগুনে রশ্মি আছে। এই রশ্মি চক্ষু রোগ ও রিকেট নষ্ট করে আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল করে তোলে। এজন্য শিশুদের সরষের তেল মাখিয়ে রোদে রাখা হয়। সূর্যের কিরণ বায়ুর জীবাণু নষ্ট করে। এজন্য জামাকাপড় বিছানা রোদে দেওয়া হয়। সকালের রোদ শরীরের পক্ষে ভালো। কিন্তু দুপুরের রোদ শরীরের পক্ষে ক্ষতি কর।

রোগ ও তার প্রতিকার

রোগ কি ?

শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা যখন থাকে না, অর্থাৎ শরীরে নানা প্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ দেখা দেয় তখনই শরীরে রোগ সৃষ্টি হয়।

রোগ কয়প্রকার ও কি কি ?

রোগ দু'প্রকার—সাধারণ ও ছোঁয়াচে।

সাধারণত রোগ কি কি প্রকারের হয় ?

সাধারণ রোগ বলতে আমরা সর্দি-কাশি ও জ্বর, চোখ ওঠা, পেটের অসুখ, নাক, কান ও গলার অসুখ ইত্যাদি বুঝি।

ছোঁয়াচে রোগ কাকে বলে ?

যে রোগ একজনের হ'লে অতি সহজে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাকে ছোঁয়াচে রোগ বলে।

কয়েকটি ছোঁয়াচে রোগের নাম কর ?

চর্মরোগ, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, বসন্ত, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি।

ছোঁয়াচে রোগ শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে ?

ছোঁয়াচে রোগ খাবারের সঙ্গে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে, জল ও বাতাসের সাহায্যে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

ছোঁয়াচে রোগ কিভাবে ছড়ায় ?

মশা, মাছি, জল, থুতু, কফ ও রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য থেকে রোগ ছড়ায়।

চর্মরোগ কি ?

দেহের চামড়ার উপর যে রোগ দেখা দেয় তাকে চর্মরোগ বলে। খোস, পাঁচড়া, দাদ, চুলকানি, একজিমা প্রভৃতি হল চর্মরোগ।

ম্যালেরিয়া রোগ কেন হয় ?

এনোফিলিস নামক স্ত্রী মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। ঐ মশা কামড়ালে ম্যালেরিয়া রোগ হয়।

ম্যালেরিয়া থেকে কিভাবে বাঁচা যায় ?

বাড়ীর আশে-পাশে ঝোপ, জঙ্গল, ড্রেন প্রভৃতি এমনভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়, যাতে মশা না জন্মে। খানা, ডোবা, ড্রেনে, কেরোসিন বা ডি. ডি. টি ছড়িয়ে মশার ডিম নষ্ট করে দিতে হয় ?

ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ কি ?

এনোফিলিস মশা কামড়াবার দশ-বারো দিনের মধ্যেই জ্বর হয়। হাই ওঠে, দেহ ভার বোধ হয়। কম্প দিয়ে জ্বর আসে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে খুব পিপাসা পায়। অনেক সময় বমিও হয়।

টাইফয়েড রোগ কি ভাবে হয় ?

এই রোগ জীবাণু দ্বারা হয়। টাইফয়েড রোগের জীবাণু মশা মাছি দ্বারা দুধ ও জলের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে।

কলেরা রোগের লক্ষণ কি ?

চালধোওয়া জলের মত বারে বারে পায়খানা ও বমি হয়। সেই সঙ্গে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। এই রোগে রোগীর খুব জল তেষ্টা পায়। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে খিল ধরে।

কলেরা রোগের প্রতিকার কি ?

এ রোগের প্রতিকার হল ঢাকা দেওয়া বিশুদ্ধ জল পান করা, জল ফুটিয়ে খাওয়া, মাছি বসা খাবার খেতে নেই। বাসি, পচা খাবার খেতে নেই। কলেরার সময় অন্য সুস্থ লোকের খুব সাবধানে থাকা ও খাওয়া উচিত। খালি পেটে থাকতে নেই। কলেরার ইঞ্জেকশন ও টীকা নেওয়া উচিত। রোগীর মলমূত্র ও বমি করা জামা কাপড় বিছানাপত্র মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়।

বসন্ত রোগ কিভাবে হয় ?

ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে বসন্ত খুব মারাত্মক রোগ। বসন্ত রোগীর গায়ে মাছি বসলে তার পায়ে বসন্তের জীবাণু লেগে যায়। কাজেই মাছি বসা খাবার খেলে, বসন্তের টীকা না নেওয়া থাকলে অথবা বসন্ত রোগীর কাছে এলে বসন্ত রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে বসন্ত রোগ হয়।

বসন্ত রোগের লক্ষণ কি ?

প্রথমে জ্বর ও শরীর ব্যথা হয়। তারপর তিন চারদিন পরে শরীরে বসন্তের গুটি বেরোয়।
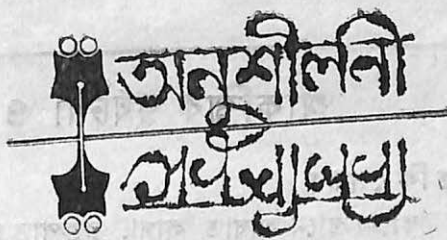
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

১। শ্বাস-প্রশ্বাস কিভাবে গ্রহণ করা উচিত ?

২। শিশুদের সরষের তেল মাখিয়ে রোদে রাখা হয় কেন ?

৩। সূর্যের কিরণে আমাদের কি উপকার হয় ?

৪। কখনকার সূর্যের কিরণ আমাদের শরীরের পক্ষে ভালো ?

৫। জামা-কাপড় বিছানা রোদে দেওয়া হয় কেন ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

১। রোগ কত প্রকার ও কি কি ? (২) কয়েকটি ছোঁয়াচে রোগের নাম কর। (৩) ছোঁয়াচে রোগ কাকে বলে ? (৪) বসন্ত রোগ কি ছোঁয়াচে রোগ ? (৫) বসন্ত রোগের লক্ষণ কি ? (৬) ম্যালেরিয়া রোগ কেন হয়। (৭) ম্যালেরিয়া থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় ? (৮) কলেরা রোগের কারণ ও লক্ষণ কি কি ?
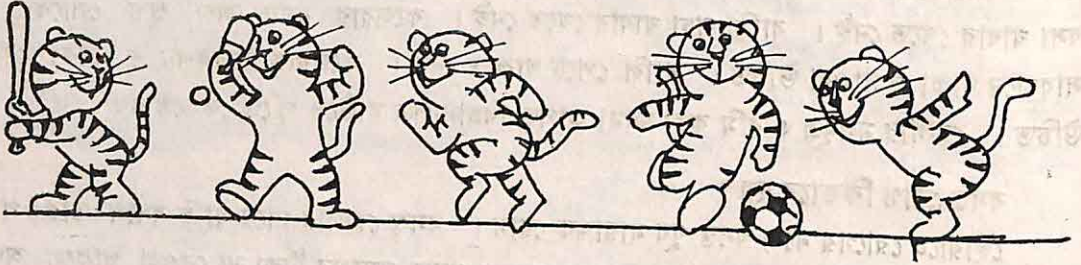
সপ্তম পরিচ্ছেদ

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

আকস্মিক দুর্ঘটনা বলতে কি বোঝ ?

হঠাৎ শরীরের কোথাও কোনো স্থানে আঘাত লাগা, রক্তপাত হওয়া, পুড়ে বা কেটে যাওয়া, জলে ডোবা, কুকুরে বা বিছায় কামড়ানো, গাড়ী চাপা ইত্যাদিকে আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসা কি ?

ডাক্তারকে রোগী দেখানোর পূর্বে সাময়িকভাবে বাড়িতে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সাধারণতঃ কি কি জিনিস প্রয়োজন ?

এই চিকিৎসার জন্য চাই একটা বাক্স। এই বাক্সে থাকবে তূলা, পরিষ্কার ন্যাকড়া, ডেটল, বেনজিন, ছুরি, কাঁচি, সাবান ও স্পিরিট, বার্নল প্রভৃতি।

হঠাৎ হাত-পা কেটে বা ছড়ে গেলে কি করতে হয় ?

ক্ষতস্থানে তূলা দিয়ে ডেটল বা টিংচার আইওডিন লাগাবে। এসব কাছে না থাকলে গাঁদা ফুলের পাতার রস কিংবা চুন লাগিয়ে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

দেহের কোথাও চোট লাগলে কি করবে ?

ক্ষত স্থানে ঠাণ্ডা জল বা বরফ লাগাতে হয়। চুণের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে একটু গরম করে লাগালেও কাজ হয়।

হঠাৎ শরীরে আগুন লাগলে কি করতে হয় ?

সাধারণতঃ গায়ের জামা-কাপড়ে আগে আগুন ধরে ওঠে। গায়ে আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে

মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হয়। গায়ের উপর কাঁথা বা কম্বল চেপে ধরলেও আগুন নিভে যায়। শরীরের কোনো অংশ পুড়ে গেলে বার্নল বা স্পিরিট লাগাবে। আগুন নেভানোর জন্য কখনও জল ঢালবে না।

ফোস্কা পড়লে বা পুড়ে গেলে কি করবে ?

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানে বার্ণল বা স্পিরিট ন্যাকড়ায় ঢেলে লাগিয়ে দিতে হয়। হাতের কাছে বার্ণল না পেলে গোল আলুর রস ক্ষতস্থানে লাগালে উপকার হয়।

জলে-ডোবা রোগীকে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হয় ?

জলে ডোবা রোগীকে জল থেকে তুলে প্রথমে দেখবে কাদা মাটিতে তার নাক মুখ বন্ধ আছে কিনা। যদি থাকে তবে তাড়াতাড়ি সেগুলো পরিষ্কার করবে, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার কোন অসুবিধা না হয়। পরে তাকে মাটির উপর ওপর করে শুইয়ে দেবে। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পেটের উপর হাত দিয়ে চাপ দেবে। এইভাবে কয়েকবার করলেই জলে ডোবা লোকটির ফুসফুসে যে জল আছে, তা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

সাপে কামড়ালে কি করবে ?

বিষওয়ালা সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানের ২।৩ ইঞ্চি পরপর দুই জায়গায় দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেবে। তারপর ক্ষত স্থানটি ছুরি দিয়ে চিরে চেপে খানিকটা রক্ত বের করে দেবে।

কুকুরে কামড়ালে কি করতে হয় ?

কুকুরে কামড়ালে ক্ষতস্থানে কার্বলিক এ্যাসিড বা টিংচার আইওডিন লাগিয়ে দিতে হয়। পাগলা কুকুর কামড়ালে যথাযথ চিকিৎসা করতে হয় এবং ইঞ্জেকশন দিতে হয়। নতুবা জলাতঙ্ক রোগ হবার ভয় থাকে।

(১) প্রাথমিক চিকিৎসা কি ? (২) প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে কি কি থাকে ? (৩) শরীরের কোথাও কোনো চোট লাগলে কি করবে ? (৪) দেহের কোন অংশ পুড়ে গেলে কি করবে ? (৫) গায়ে আগুন লাগলে কি করতে হয় ? (৬) জলে ডুবে গেলে কি করতে হয় ? (৭) সাপে কামড়ালে কি করবে ? (৮) কুকুরে কামড়ালে কি হয় ?

তৃতীয় অধ্যায় **সামাজিক শিক্ষা**

সামাজিক শিক্ষা বলতে কি বোঝায় ?

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা করতে হয়। সেইজন্য আমাদের কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে, কিরকম ব্যবহার করতে হবে, সেগুলি জানা প্রয়োজন। এই আচার-আচরণ শিক্ষাই হল সামাজিক শিক্ষা।

পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় ?

পিতামাতা ও গুরুজনদের কথা সর্বদা মেনে চলতে হয়। কখনও তাঁদের অবাধ্য হতে নেই। তাঁরা যখন যা আদেশ করবেন তা করা উচিত। রাস্তায় চলার পথে পরিচিত গুরুজন দেখলে নমস্কার করে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয়।

ছোটদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হয় ?

তাদের সঙ্গে কখনও ঝগড়া বা মারামারি করতে নেই। তাদেরকে স্নেহ করা উচিত। খুব শান্ত মাথায় কথা বলতে হয়।

বিদ্যালয়ে কিরূপ আচরণ করা উচিত ?

বিদ্যালয়ে কখনও গোলমাল করতে নেই। বিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে চলতে হয়। শিক্ষক মহাশয়ের কথা সর্বদা মন দিয়ে শুনতে হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শ্রেণীতে ঢুকলেই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান দেখাতে হয়। ছুটির পর লাইন দিয়ে পরপর বের হতে হয়।

সহপাঠীদের সঙ্গে তোমরা কিরূপ ব্যবহার করবে ?

যারা তোমাদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, তারা তোমাদের সহপাঠী। তাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। তাদের সঙ্গে মিলে মিশে খেলাধূলা করবে।

অন্ধ বা দুর্বলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় ?

অন্ধ বা দুর্বলকে সর্বদা দয়া করতে হয়। তাঁদেরকে সাহায্য করতে হয়। অন্ধকে হাত ধরে রাস্তাপার করে দিতে হয়।

বাড়ীতে কিরূপ আচরণ করতে হয় ?

বাবা মা ও অন্যান্য গুরুজনদের ভক্তি করতে হয় এবং তাঁদের আদেশ পালন করতে হয়। ছোট ছোট ভাই বোনেদের ভালবাসবে এবং বাড়ীর চাকর চাকরানীদের আপনজন বলে মনে করতে হয়। বাড়ীর আর্বজনা দূর করা, উদ্যানের কাজ, গৃহপালিত পশু প্রতিপালনের কাজে সহায়তা করতে হয়। তাহলেই সুন্দর পরিবার গড়তে পারা যায়।

আত্মীয় ও অতিথিদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে ?

বাড়ীতে আত্মীয় ও অতিথি এলে পরম আদরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে দিতে হয়। তাঁদের হাত-পা ধোওয়ার জল এনে দিতে হয়। তাঁদের আহারের এবং বিশ্রামের সুব্যবস্থা করতে হয়। তাঁদের সাথে ভালভাবে কথা বলতে হয়।

১। সামাজিক শিক্ষা বলতে কি বোঝায় ?

২। পিতামাতা ও গুরুজনদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা উচিত ?

৩। বাড়ীতে আত্মীয় বা অতিথি এলে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে ?

৪। অন্ধকে কি ভাবে সাহায্য করা যায় ?

চতুর্থ অধ্যায়

নাগরিক কাদের বলে ?

যারা যে দেশে বা রাষ্ট্রে বাস করে, তারা সেই দেশের বা রাষ্ট্রের নাগরিক।

আমরা কোন্ দেশের নাগরিক ?

আমরা ভারতবর্ষে বাস করি। তাই আমরা ভারতের নাগরিক।

নাগরিক শিক্ষা কি ?

প্রত্যেক নাগরিকদের দেশের কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এসব নিয়ম-কানুন শেখাকেই নাগরিক শিক্ষা বলে।

আদর্শ নাগরিকের কর্তব্য কি ?

আদর্শ নাগরিকের কর্তব্য হল, তার প্রতিবেশী, তার গ্রাম বা শহর ও তার দেশকে ভালবাসা।

আমরা কি ভাবে নাগরিক কর্তব্য পালন করতে পারি ?

বাড়ীঘর পরিচ্ছন্ন রেখে, বাড়ীর সামনের রাস্তায় ধূলো ময়লা না ফেলে, যেখানে সেখানে আবর্জনা না ফেলে বা মলমূত্র ত্যাগ না করে, নির্দ্ধারিত স্থানে আবর্জনা ফেলে, মলমূত্র ত্যাগ করে, আমরা নাগরিক কর্তব্য পালন করতে পারি।
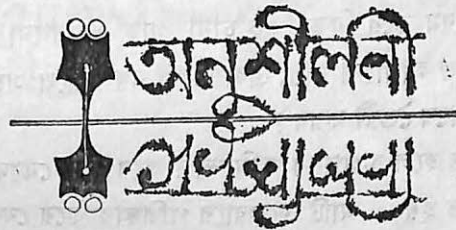
(১) আমরা কোন্ দেশের নাগরিক ? (২) আদর্শ নাগরিকের কাজ কি ? (৩) আমরা প্রতিনিয়ত কি ভাবে নাগরিক কর্তব্য পালন করতে পারি ? (৪) নাগরিক শিক্ষা কি ?

পঞ্চম অধ্যায় **কর্মশিক্ষা**

কর্মশিক্ষা কাকে বলে ?

লেখা পড়া শেখার সাথে সাথে হাতে কলমে যে-সব জিনিস শেখা হয় তাকে কর্মশিক্ষা বলে ।

কর্ম শিক্ষার প্রয়োজন কেন ?

কর্ম শিক্ষার অর্থ হল কাজ শেখা । লেখা পড়া শেষ করার পর প্রত্যেককেই কোন না কোন একটা কাজ বেছে নিতে হয় এবং কাজ করতে ও হয় । এই কাজ করে তাকে অর্থ উপার্জন করতে হয় । তাই লেখাপড়ার শেখার সাথে সাথে কাজ করার অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা অর্জন করলে কর্ম জীবনটা অনেকটা সহজ হয়ে যায় । তাই কর্ম শিক্ষা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ।

কি কি কর্মশিক্ষা আমরা এই ছাত্র অবস্থায় শিখতে পারি ?

বাগানের কাজ, মাটির কাজ, টুকরো কাগজের কাজ, চাষ-বাস, বই বাঁধাই, প্লাস্টার অফ প্যারিসের ফটো বাঁধাই, মোমবাতি তৈরী প্রভৃতি ।

॥ বাগানের কাজ ॥

বাগানের কাজ কি ?

গ্রামের অনেকের বাড়িতে বাড়ির সঙ্গে একটু খালি জমি থাকে । এই জমিতে ছোট হাত কোদাল বা নিরানি দিয়ে মাটি নরম করে কিছু কিছু চারা গাছ লাগানো যায় । পালং শাক, বেগুন গাছ, লঙ্কা গাছ প্রভৃতি গাছ সহজে লাগানো যায়, এবং একটু যত্ন করলে সহজেই বেড়ে উঠে ।

ফুল বাগান আমরা কিভাবে তৈরী করব ?

ফুলের বাগান তৈরী করতে হলে বাগানের জমি ভাল করে হাত কোদাল দিয়ে চাষ করতে হয় । আগাছাগুলি ও ঘাস তুলে ফেলতে হয় । মাটি একেবারে পরিস্কার করে ফেলতে হয় । এবার এক এক সারিতে এক এক ধরণের ফুলের চারা পুতে দিতে হয় । বাগানের ভেতরকার রাস্তার দুধারে নানা প্রকারের পাতা বাহারের চারা লাগালে বাগান খুব সুন্দর দেখাবে । গোলাপ ও আরও অন্যান্য ফুল-গাছের গোড়ায় সার দিতে হয় । নিয়মিত জল দিতে হয় । ফুল গাছের চারা প্রয়োজন মত দূরত্ব বাজায় বেখে লাগাতে হয় । মাঝে মাঝে ফুলের চারার গোড়ায় নিরানি দিয়ে মাটি নরম করে দিতে.হয় ।

সবজীর বাগান আমরা কিভাবে তৈরী করব ?

সবজীর বাগান তৈরী করতে হলে আগে বাগানের চারদিকে বেড়া দিয়ে নিতে হয়। বাগানের জমি বেশ ভালো করে কোপাতে হয়। মাটির মধ্যে কোন কাঁকড় বা ইটির গুড়ো যাতে না থাকে। পরে জমি থেকে জঙ্গল বা আগাছা সমূহ উপড়ে ফেলে দিয়ে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিতে হয়। তারপর সবজীর বীজ ঐ নরম মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হয়। কোন কোন সবজীর চারা সার বেঁধে পুঁতে দিতে হয়। সারা বাগানে সকাল বিকাল ভালো করে জল দিতে হয়।

॥ মাটির কাজ ॥

মাটির কাজ করতে হলে কি ধরণের মাটির প্রয়োজন ?

মাটির কাজে এঁটেল মাটি সবচেয়ে ভালো।

কিভাবে মাটি তৈরী করতে হয় ?

মাটি আগে ভালো করে গুঁড়ো করে শুকোতে হয়। শুকোবার পর সেই মাটি থেকে ঘাস, খড়, ইটের কুঁচো প্রভৃতি ফেলে দিতে হবে। তারপর সেই গুঁড়ো মাটিতে আন্দাজ মত জল ঢেলে ময়দার মত ভালো করে ছানতে হবে। মাটি তৈরী হবার পর ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী মাটি ঢেকে দিতে হবে। এভাবে ঢেকে রাখলে তৈরী মাটি ভালো থাকবে।

মাটি দিয়ে কি কি জিনিস তৈরী করা যায় ?

এই মাটি দিয়ে মাটির রসগোল্লা, সন্দেশ, পুতুল, পশু পাখী, থালা, বাটি, গ্লাস, কলসি, ফুল,
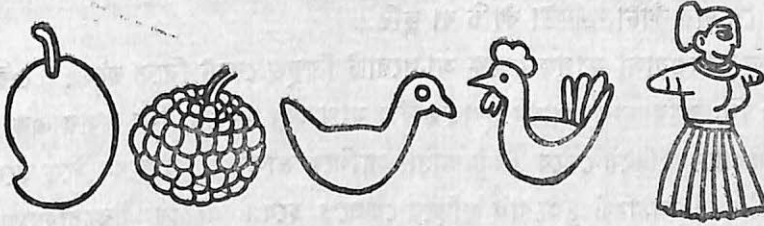
ফল, মূর্তি প্রভৃতি তৈরী করা যায়। তৈরী করা জিনিসগুলো রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

॥ কাগজের কাজ ॥

কাগজের কাজ শিখতে হলে প্রথমে কি শিখতে হবে ?

কাগজের কাজ করবার আগে কাগজকে নানাভাবে ভাঁজ করার কায়দা-কানুন শিখতে হবে। কাগজকে কিভাবে চারকোণা এবং ত্রিকোণাকার ভাবে ভাঁজ করা যায় তাও আয়ত্ত করতে হবে। কাগজ নানাভাবে ভাঁজ করতে জানলে অল্প কাগজে নানা ধরনের বেশী জিনিস তৈরী করা যায়।